# সানজাক-ই উসমান

প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

# প্রকাশকের কথা

আজ থেকে আটশো বছর আগে পৃথিবীর বুকে কিয়ামতের আগেই নেমেছিল আরেক কিয়ামত। সভ্য জগৎ থেকে অনেক দূরের মঙ্গোলিয়ান স্তেপ থেকে বর্বর এক বাহিনী নিয়ে বের হয়ে এসেছিলেন ইতিহাসের ভয়ংকরতম খুনি চেঙ্গিজ খান। মাত্র কুড়ি বছরের ব্যবধানে পালটে গেল পৃথিবীর ক্ষমতা কাঠামো। মোঙ্গলদের তলোয়ারের নিচে পড়ে খড়কুটোর মতো উড়ে গেল সাইবেরিয়া, চীন, মধ্য এশিয়া, খোরাসান, আফগানিস্তান আর ইরানের চার কোটি মানুষ। একসাথে এত লাশ পৃথিবী আর কখনো দেখেনি!

চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পরও মোঙ্গল ঝড় থামেনি। এই ঝড় অপ্রতিরোধ্যভাবে আছড়ে পড়ল রাশিয়া, ইউক্রেন আর হাঙ্গেরিতে। সর্বগ্রাসী এই বর্বর বাহিনী পঙ্গপালের মতো আঘাত হানল তুরস্কের আনাতোলিয়া আর আব্বাসীয় খিলাফতের প্রাণকেন্দ্র ঐতিহাসিক বাগদাদে। নেতৃত্ব আর ঐক্যের অভাবে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিলীন হলো পাঁচশো বছরে গড়ে ওঠা ইসলামি সভ্যতা। তৎকালীন বিশ্ব সভ্যতার কেন্দ্র আর শিক্ষা ও শিল্পের আভিজাত্যের প্রতীক বাগদাদ শহরের পতনের সঙ্গে শেষ হয়ে গেল আব্বাসীয় খিলাফত।

বাগদাদের পতনের পর যখন সব আশাই শেষ, তখন বর্বর মোঙ্গলরা ফিলিস্তিনে এসে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হলো মিশরীয় এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষের। ইতিহাসে যারা বাহরিয়্যা মামলুক নামে পরিচিত। বাইরে থেকে মামলুক আর ভেতর থেকে বন্দিনী মুসলিম নারীরা বদলে দিতে লাগলেন পৃথিবীর ক্ষমতা কাঠামো। একশো বছরের মধ্যে মোঙ্গলদের বিরাট একটা অংশ ইসলাম গ্রহণ করল। ং

এদিকে তুরস্কের আনাতোলিয়ায় কায়ী গোত্রের তুর্কি বীর আরতুরুলের সন্তান উসমানের নেতৃত্বে উত্থান হলো এক নতুন শক্তির। পৃথিবীর ইতিহাসে গ্রেট অটোম্যান সাম্রাজ্য বা উসমানিয়া সাম্রাজ্য হিসেবে পরিচিত। উসমানের নেতৃত্বে কঠোর পরিশ্রম, ইমানি চেতনা, অসাধারণ বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তায় এরা ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছিল এক শক্তিশালী, সুশৃঙ্খল সাম্রাজ্য।

সুলতান বায়েজিদের নেতৃত্বে গোটা ইউরোপের সামরিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে উসমানীয়রা যখন এক অপ্রতিরোধ্য পরাশক্তি হয়ে উঠছিল, তখনই আনকারার ময়দানে সুলতান বায়েজিদের সাথে মধ্য এশিয়ার তৈমুর লং-এর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সুলতান বায়েজিদের পরাজয়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল উসমানীয় সাম্রাজ্য।

তারপর? কী হলো তারপর? কীভাবে উঠে দাঁড়াল উসমানীয়রা? কীভাবে সুলতান মুহাম্মদ আল ফাতিহ পূর্ণ করেছিলেন মুহাম্মদ (সা.)-এর কনস্ট্যান্টিনোপল জয়ের ভবিষ্যদ্‌বাণী? কীভাবে উসমানীয়রা ঘুড়ে দাঁড়িয়ে পুরো ইউরোপে ছড়ি ঘুরিয়ে পরবর্তী প্রায় পাঁচশো বছর পৃথিবী শাসন করেছিল?

তরুণ লেখক প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল লিখিত *সানজাক-ই উসমান: অটোমানদের দুনিয়ায়* আপনাদের সামনে নিয়ে আসছে এই ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প। এ গল্প কেবল রাজশক্তির উত্থানের গল্প নয়। এ গল্প মোঙ্গল আক্রমণে ছাই হয়ে যাওয়া ইসলামি সভ্যতার ফের মাথা উঁচু করে উঠে দাঁড়ানোর গল্প। বইটি প্রকাশ করতে পেরে '*গার্ডিয়ান পাবলিকেশন*' উচ্ছ্বাসিত ও রোমাঞ্চিত! সম্মানিত লেখকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্য ইতিহাসের একজন সুলেখক পেতে যাচ্ছে। এই বই প্রকাশের সঙ্গে সম্পৃক্ত গার্ডিয়ানের কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী এবং পুরো গার্ডিয়ান টিমকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ইতিহাসের পরিভ্রমণে আপনাকে স্বাগতম।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
১২ এপ্রিল, ২০১৮ ইং
বাংলাবাজার, ঢাকা।

# লেখকের কথা

আমার কাছে মনে হয়, পৃথিবীতে তিন ধরনের ভালো বই আছে। প্রথম ধরনের বই আপনাকে আনন্দ দেবে, পড়বেন, ভালো লাগবে, তারপর ভুলে যাবেন। দ্বিতীয় ধরনের বই আপনাকে জীবন নিয়ে ভাবতে শেখাবে। আর তৃতীয় ধরনের বই, আপনার জীবনটাকে বদলে দিবে।

আমার এ বই এই তিন ধরনের ভালো বইয়ের ক্যাটাগরির কোনোটায় পড়বে কিনা সে নিয়ে ভাবনা-চিন্তার দায়টা আমি পাঠকের ওপরেই ছেড়ে দিতে চাই।

ইতিহাস বলতে আমরা কী বুঝি?

আমি বুঝি, ইতিহাস হলো শব্দের ক্যানভাসে সময়ের ছবি আঁকা। এই ছবি নিখুঁত করে আঁকতে পারাটাই ইতিহাস নিয়ে লেখালেখির মূল কথা। শুধু বাংলাদেশ না, সারা পৃথিবীতেই ইতিহাস নিয়ে যে সমস্যাটা জারি আছে তা হলো, সময়ের ছবি নিখুঁত করে আঁকতে গিয়ে প্রথাগত ঐতিহাসিকরা ছবিকে এত বিরক্তিকর করে ফেলেন যে সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তরুণরা সময়ের সেই ছবির দিকে আর তাকাতেই চায় না। অপরপক্ষে, ঐতিহাসিক উপন্যাস যারা লেখেন, তারা এত রংচং লাগান যে, আমরা অতীতের ঘটনাগুলোর সঠিক ছবিটা আর পাই না। আমি এখানে দুটো জনরার মিশেলে নতুন ক্যানভাসে, নতুন রং-তুলি ব্যবহার করে ভিন্ন এক ছবি আঁকার পথে হেঁটেছি।

বইয়ের কভারে কেবল লেখা থাকে লেখকের নাম, কিন্তু বইয়ের প্রতিটা পাতার নেপথ্যে আরও অনেকের আত্মত্যাগ মিশে থাকে।

আমার প্রথম কৃতজ্ঞতা তারিকুর রহমান শামীম ভাইয়ের প্রতি। আমাকে তিনি দেখেছেন একেবারে কিশোর বয়স থেকে, আমার চিন্তাভাবনায় তার প্রভাব কতখানি, তা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। এই বইয়ের গ্রন্থপঞ্জিতে থাকা অতি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বই তিনিই আমাকে যোগাড় করে দিয়েছেন, অন্যথায় আমার পক্ষে সেগুলো কিনে পড়া দুঃসাধ্য ছিল। এরপরেই আসবে নাজমুস সাকিব নির্ঝর ভাইয়ের নাম। আমার মতো একজন আনকোরা লেখকের প্রচেষ্টাকে ছাপাখানার চেহারা দেখাতে নির্ঝর ভাইয়ের উদ্যোগ ছিল অসামান্য। বইয়ের রেফারেন্সিং, নামকরণ ও সম্পাদনা নিয়ে নির্ঝর ভাইকে আমি যথেষ্ট জ্বালিয়েছি, কিন্তু তিনি কখনো বিরক্ত হননি। এই বই লেখার সময় একজন অসাধারণ মানুষের অকৃত্রিম স্নেহে আমি ধন্য হয়েছি, তিনি ফজলুল করিম রিয়াদ ভাই। আমার জন্য তিনি বিসিএস পরীক্ষার প্রস্তুতি বাদ দিয়ে নিরলস পরিশ্রম করেছেন, এ আমার সৌভাগ্য। এই বইয়ের নেপথ্যে থাকা আমার চিন্তার জ্বালানি সরবরাহ করতে আশফাক ভাই ও মাসরুর ভাইয়ের অবদান কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যাবে না।

এবার বন্ধুদের কথায় আসি। আমার অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু পান্থকে রেফারেন্সিং ও এডিটিংয়ের জন্য দিনের পর দিন অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। সে সহযোগিতা না করলে এই বই এত দ্রুত

আলোর মুখ দেখত না। বইয়ের প্রাথমিক কাঠামোটা বিন্যাসের কাজ করেছিল বন্ধু তন্ময়। রেফারেন্সিং করতে সময় দিয়েছে অপুও। এরা যে ভালোবাসা নিয়ে আমার জন্য কাজ করেছে, তা কোনো পেশাদারকে দিয়ে করানো সম্ভব না। বইটার কাজ যখন শুরু করি, তখন আমি জীবনের সবচেয়ে সংকটময় সময়গুলোর একটা পার করছিলাম। আমার বন্ধু শাওন, পান্থ আর সারা আমাকে আত্মবিশ্বাস আর সাহস জুগিয়েছে। সময়ের পরিক্রমায় শাওন আর পান্থ আমার কাছাকাছিই আছে, আল্লাহ যেন কখনো ওদের আমার কাছ থেকে দূরে না সরান। সারা এখন সুদূর অস্ট্রেলিয়ায়। তার এটা মনে করার কোনো কারণ নেই আমি তাকে ভুলে গেছি।

এ ছাড়াও বন্ধু মারুফ, রাজু, মোহাইমিনুল, তৌহিদ, তুহিন, তারেক, সালমান, স্নেহের অনুজ শরিফুল, জিদান, নীল, ফারদিন ও মুজাম্মেলের কথা বলতেই হবে। পাঠকদের ভেতর চারজনকে বিশেষভাবে মনে পড়ছে। আরাফাত ভাই, রাফি ভাই, আমান ভাই ও তিমা আপু। আল্লাহ আপনাদের ভালো রাখবেন, এই প্রত্যাশাই করি।

আমার গোটা শিক্ষাজীবন যে ব্যক্তির কাছে ঋণী তার নামটি উল্লেখ করতে চাই, জনাব এমদাদ ইসলাম। আমি তাঁকে কখনো ভুলব না। ধন্যবাদ পাওনা আমার বাবা-মায়েরও। তাঁরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিসিএস ক্যাডার হওয়ার গড্ডালিকা প্রবাহে গা-ভাসানোর চেয়ে সবসময় আমার ইচ্ছাকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। ধন্যবাদের দাবিদার প্রকাশক নূর মোহাম্মাদ ভাই, যিনি এই অখ্যাত তরুণের বই প্রকাশের মতো একটা ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হাতে নেওয়ার সাহস দেখিয়েছেন। আরেকজনের কথা না বললেই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক, প্রফেসর ড. ছিদ্দিকুর রহমান খান স্যার। ওনার মতো একজন পণ্ডিত মানুষের কাছ থেকে যে সুহৃদ ব্যবহার আমি পেয়েছি, তা আমার জন্য অপ্রত্যাশিত ছিল।

আমি ইতিহাসের একটা ভিন্ন, মানবিক বর্ণনা পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়েছি। এই বর্ণনা, এই ইতিহাস পাঠ্য বইয়ের প্রচলিত অনেকাংশেই ঔপনিবেশিক ইতিহাসবীক্ষণের সঙ্গে মিলবে না। সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্য পাঠককে রেফারেন্স চেক করার অনুরোধ জানাই।

নতুন সহস্রাব্দের শুরুতে পৃথিবীতে এক নতুন বিশ্বব্যবস্থা গড়ে উঠতে যাচ্ছে। পুরোনোকে আমাদের দেখতে হবে এই নতুন সময়ের চোখ দিয়ে। পৃথিবী দেখার লেন্সটাকে বদলে ফেলবেন, না পুরোনোটা দিয়েই দেখবেন, সিদ্ধান্ত আপনার। সময় থেমে থাকে না।

প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০ মার্চ, ২০১৮

# মুখবন্ধ

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে দামেস্ককেন্দ্রিক উমাইয়া রাষ্ট্রশক্তিকে উৎখাত করে আব্বাসিরা আরব মুসলিম বিশ্বে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, তারপর কেটে যায় পাঁচশো বছর। আব্বাসি সাম্রাজ্য তার শৈশব, কৈশোর, সোনালি যৌবন অতিক্রম করে জরাগ্রস্ত বার্ধক্যের কবলে নিপতিত হয়। ধর্মীয় চেতনাবোধ ও যোগ্য নেতৃত্বের অভাব, তদুপরি রাজনৈতিক অনৈক্যের ফলে আব্বাসীয় শক্তির পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। ত্রয়োদশ শতকের গোড়ার দিকে মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক মঞ্চে আবির্ভূত হয় এক নতুন শক্তি। ইতিহাসে তারা পরিচিত মোঙ্গল নামে। চেঙ্গিজ খানের নেতৃত্বে অশিক্ষিত ও প্রায় বর্বর মোঙ্গলরা নিজভূম ছেড়ে বের হয়ে আসেন এবং মাত্র কুড়ি বছরের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন এক নতুন সাম্রাজ্যের। চেঙ্গিজ খানের উত্তরসূরি হালাকু খান ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে ধ্বংস করেন ইসলামি সভ্যতার সোনালি যুগের অহংকার আব্বাসীয়দের রাজধানী বাগদাদ। এরপর গোটা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে চীন থেকে শুরু করে সমগ্র মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া জুড়ে চলে মোঙ্গলদের শাসন-শোষণ। তবে মোঙ্গলদের মহাপ্রতাপের যুগেই আফ্রিকার মিসরে এক নতুন রাজশক্তির উদ্ভব ঘটে। মামলুক নামে পরিচিত এ রাজশক্তিটি মোঙ্গল ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে কেবল সিরিয়া, মিসর ও মুসলিম বিশ্বের প্রধানতম তীর্থস্থান পবিত্র মক্কা-মদিনাকেই রক্ষা করেনি; বরং সদ্যবিলুপ্ত আব্বাসীয় খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে ইতিহাসের গতিধারাকে নতুন পথে সঞ্চালিত করে।

আজকের দিনে মধ্যপ্রাচ্য নামে খ্যাত পশ্চিম এশিয়া এবং আফ্রিকা অভিমুখী মোঙ্গল আগ্রাসন প্রতিহতকরণে যখন মিসরের মামুলকরা ব্যতিব্যস্ত, তখন আনাতোলিয়ায় (এশিয়া মাইনর ও এশিয়ান তুরস্ক নামেও পরিচিত। এ অঞ্চল নিয়েই গড়ে ওঠেছে আধুনিক তুরস্কের সিংহভাগ) আরেক নতুন রাজশক্তির উত্থান ঘটে। এ রাজশক্তির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন উসমান বিন তুগরুল। প্রতিষ্ঠাতা উসমানের নামানুসারে এ রাজবংশটি উসমানলি বা উসমানীয় সালতানাত নামে পরিচিত। তবে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বর্ণনাসূত্রে এ সাম্রাজ্যটি অটোমান নামে বহুল পরিচিতি লাভ করে।

প্রাক-আধুনিক যুগের ইতিহাসে অটোমান সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম রাজশক্তি। এর পরিব্যাপ্তি এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জুড়ে বিস্তৃত ছিল। এমন বিশাল আয়তনের রাষ্ট্রশক্তি প্রাচীন রোমীয় আমল ও প্রারম্ভিক মধ্যযুগের আরব প্রাধান্যের যুগ ব্যতীত দেখা যায় না। শুধু বিশাল বিস্তৃতি নয়, আয়ুষ্কালের দিক থেকেও অটোমান সাম্রাজ্য ছিল অনন্য। সমাজতত্ত্ববিদদের মতে, একটি সাম্রাজ্যের সাধারণ গড় স্থিতিকাল একশো বছর। কিন্তু অটোমান সাম্রাজ্যের স্থিতিকাল ছিল ছয়শো বছরেরও অধিককাল। এ সময়ের মধ্যে বিশাল বিস্তৃত সাম্রাজ্যটি কখনো দ্বিধাবিভক্ত হয়নি।

দশম শতাব্দীতে আরব মুসলিম সাম্রাজ্য তিনটি খিলাফতে বিভক্ত হলেও অটোমানরা নিজেদের কেন্দ্রীভূত শক্তিকে ধরে রাখতে পেরেছিল। মুসলমানদের পবিত্র স্থান মক্কা-মদিনার নিয়ন্ত্রণভারসহ ষোড়োশ শতাব্দীর শুরুতে খিলাফতেরও দায়িত্বভার গ্রহণের ফলে তারা জাগতিক রাষ্ট্রশক্তির কর্ণধার থেকে মুসলিম বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের অধিকারী হিসেবেও আবির্ভূত হয়।

তরুণ ও প্রতিশ্রুতিশীল লেখক প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল-এর প্রথম গ্রন্থ *সানজাক-ই উসমান : অটোমানদের দুনিয়ায়* এতদ্‌বিষয়ে রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে একটি নতুন ও ব্যতিক্রমী সংযোজন। গ্রন্থটির প্রতিটি ছত্রেই রয়েছে ইতিহাসের উপাদান। গ্রন্থটি আটটি অধ্যায়ে বিভক্ত। বিন্যস্ত অধ্যায় শিরোনামসহ উপজীব্য বিষয়ের উপশিরোনামগুলোও চমৎকার ও আকর্ষণীয়। অটোমান রাষ্ট্রশক্তির উত্থান ও বিকাশধারা গ্রন্থকারের মূল লক্ষ্যস্থল হলেও প্রসঙ্গক্রমে এতে স্থান পেয়েছে আব্বাসি রাজশক্তি ও আরব সভ্যতার বিপর্যয়, মোঙ্গলদের উত্থান ও বিকাশ, মিসরের মামলুকদের মোঙ্গল প্রতিরোধ ও মুসলিম সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষায় তাদের অবদান। লেখক পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন মধ্যযুগের ক্ষয়িষ্ণু ইউরোপের ঘুরে দাঁড়ানো ও তাদের রেনেসাঁর প্রতি।

এটি কোনো সাধারণ ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ নয়। তাই ইতিহাস বোদ্ধারা এতে ইতিহাসের প্রণালিসিদ্ধ রচনা পদ্ধতির আলোকে বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করলে হতাশ হবেন। তবে সাধারণ পাঠকসহ ইতিহাসের পাঠক ও গবেষকের জন্য এ বইটি গুরুত্ব কম হবে না। কারণ, ইতিহাসের জ্ঞাত এবং বিশেষ করে অন্তরালে চাপা পড়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলিকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনার চেষ্টা রয়েছে বইটিতে। ইতিহাসের ছাত্র বা গবেষক না হয়েও ইতিহাসের প্রতি অনুরাগ থেকে লেখক আলোচ্য গ্রন্থটি রচনার যে উদ্যোগ নিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আমি তাঁর এ দুঃসাহসী আন্তরিক প্রয়াসকে স্বাগত জানাই। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, তরুণ লেখকের ব্যতিক্রমী রচনাটি ইতিহাসের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, গবেষক, ইতিহাস অনুরাগী ও সাধারণ পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে।

আমি *সানজাক-ই উসমান : অটোমানদের দুনিয়ায়* শীর্ষক গ্রন্থটির বহুল প্রচার কামনা করছি। অপার সম্ভাবনাময় লেখক প্রিন্স মুহাম্মাদ সজল-এর জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা।

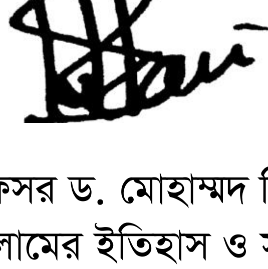

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
এপ্রিল, ২০১৮

# ভূমিকা

‘কিয়ামত তত দিন পর্যন্ত সংঘটিত হবে না, যত দিন না লাল মুখওয়ালা, ছোটো ছোটো তির্যক চোখ ও চ্যাপটা নাকবিশিষ্ট তাতারেরা তোমাদের ওপর চড়াও হবে। তারা পূর্বদিক থেকে আসবে এবং পশম লাগানো চামড়ার জুতা পরবে, আর তাদের মুখ হবে ঢালের মতো প্রশস্ত। তারা তোমাদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলবে, যেমন করে পঙ্গপালের ঝাঁক আকাশকে ঢেকে দেয়।’
সহিহ বুখারি : ২৭৭০

এই ভবিষ্যদ্‌বাণী মিথ্যা হয়নি। সত্যি সত্যিই রাসূল (সা.)-এর ওফাতের সোয়া ছয়শো বছর পর পূর্বদিকে এক বড়োসড়ো ঝড় ওঠে, চেঙ্গিজ খানের তলোয়ারের ধারে বদলে যেতে থাকে দুনিয়ার মানচিত্র।

১২০৬ সালে মঙ্গোলিয়ার স্তেপে আধাবুনো, অর্ধসভ্য কিছু যাযাবর উপজাতিকে নিয়ে চেঙ্গিজ খান যে সাম্রাজ্যের সূচনা করেন, তা পরবর্তী কুড়ি বছরে পৃথিবী জুড়ে নিয়ে আসে কিয়ামতের আগেই আরেক কিয়ামত। চীন, তুর্কিস্তান, আফগানিস্তান, খোরাসান, ইরান হয়ে ককেশাস থেকে একেবারে রাশিয়া পর্যন্ত চেঙ্গিজ খান হত্যা করেন কোটি কোটি মানুষকে, কায়েম করেন এক আতঙ্কের সাম্রাজ্য। এটাই ইতিহাসে মানুষের জয় করা সবচেয়ে বড়ো অবিচ্ছিন্ন সাম্রাজ্য।

চেঙ্গিজ খানের মৃত্যুর পরেও মোঙ্গলরা থামেনি, একে একে তারা কবজা করেছে প্রায় পুরো মধ্যপ্রাচ্য। ১২৫৮ সাল নাগাদ তারা এসে পড়ে বাগদাদের দোরগোড়ায়। আরব্য রজনীর সেই বাগদাদ, আব্বাসিয়া খিলাফত তথা ইসলামি সভ্যতার সোনালি যুগের প্রতীক বাগদাদ।

ইসলামি সভ্যতার স্বর্ণযুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল এর বহু আগেই। রাজনৈতিক ও ধর্মীয়ভাবে বহুধাবিভক্ত মুসলিম উম্মাহ মোঙ্গল আগ্রাসনের সামনে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্প-সংস্কৃতিতে যোজন যোজন এগিয়ে থাকার পরও ইমান, ঐক্য আর নেতৃত্বের অভাব মুসলমানদের পরিণত করে মোঙ্গলদের দাসে। চীনাদের পরিণতিও হয় একই রকম।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর পুরোটা জুড়েই ছিল পৃথিবীর দিকে দিকে মোঙ্গলদের ত্রাসের রাজত্ব। কিন্তু এর মাঝেই নতুন এক শক্তির উত্থান ঘটে মিসরে। মামলুকরা জীবন বাজি রেখে মোঙ্গলদের হাত থেকে সিরিয়া, মিসর ও মক্কা-মদিনাকে রক্ষা করে। আইন জালুত আর হোমসের যুদ্ধের পর পালটে যেতে শুরু করে ইতিহাসের স্রোতধারা।

চেঙ্গিজ খানের মোঙ্গলদের হাত থেকে পালিয়ে বেঁচে যাওয়া তুর্কি মুসলিমরা আনাতোলিয়াতে গড়ে তুলতে থাকে নতুন সভ্যতা। এদের মধ্যেই একজন ছিলেন আরতুরুল বের ছেলে উসমান।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে আনাতোলিয়ায় যে মুসলিম আমিরাতগুলো জন্ম নেয়, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো আমিরাতের সুলতান ছিলেন তিনি।

এই উসমান থেকেই অটোমান সালতানাতের উত্থানের গল্পটা শুরু।

আনাতোলিয়াতে উসমানের বংশধররা যখন গড়ে তুলছিল নতুন এক ইসলামি সভ্যতা, তখন ইউরোপের ব্যাপারটা ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মোঙ্গল আক্রমণ থেকে মোটের ওপর বেঁচে যাওয়া ইউরোপ উচ্চ মধ্যযুগের সমৃদ্ধ সময়কে পেছনে ফেলে এসেছে।

একের পর এক ক্রুসেডে পরাজয়, পোপের সঙ্গে সম্রাটদের বিবাদ, সামাজিক অসংগতি, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস, সেইসঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তন ও মহামারি ইউরোপের ওপর মরণ ছোবল হানে। ব্ল্যাক ডেথ আর দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যায় ইউরোপের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ।

ওদিকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে এশিয়াতে আবার আবির্ভাব ঘটে এক দিগ্‌বিজয়ীর। যিনি পুরো এশিয়াকে একটা বড়ো কবরস্থানে পরিণত করেন। তার নাম আমির তাইমুর, ইতিহাস কুখ্যাত তৈমুর লং।

একটা সাম্রাজ্যের গড় আয়ু সাধারণত একশো থেকে দেড়শো বছর হয়, তারপর তা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। কিন্তু এক শতাব্দী ধরে ক্রমেই বেড়ে উঠা অটোমান সালতানাতের ভেঙে পড়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। তাইমুরের আক্রমণে বিধ্বস্ত হওয়ার পরেও টিকে যায় অটোমানরা। তাদের টিকে থাকার মূলমন্ত্র ছিল সুশাসন, ইনসাফ আর পুরোনোকে লালনের সাথে সাথে নতুনকে গ্রহণ করার মানসিকতা। এভাবেই অটোমানরা পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরিণত হতে থাকে এক বিশ্বশক্তিতে। ১৪৫৩ সালে সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহর নেতৃত্বে তারা বাস্তবে রূপদান করে মহানবি (সা.)-এর আরেকটি ভবিষ্যদ্‌বাণী; কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়। মোঙ্গলদের আক্রমণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়ার দুশো বছরের মাথায় ইসলামি সভ্যতার হাল ধরে অটোমানরাই।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দারিদ্র্যপীড়িত ইউরোপ ধীরে ধীরে আড়মোড়া ভেঙে উঠতে থাকে। হাজার বছর ধরে চেপে থাকা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার আর দুঃশাসনের মধ্যেও ইউরোপে জন্ম নিতে থাকে কালজয়ী সব চিন্তাধারা ও চিন্তানায়কেরা। এখান থেকেই শুরু ইউরোপিয়ান রেনেসাঁ।

*সানজাক-ই উসমান : অটোমানদের দুনিয়া'* বইটিতে আলোচনায় এসেছে মোঙ্গলদের উত্থান, সাম্রাজ্য বিস্তার থেকে শুরু করে ক্রমেই তাদের দুটো বৃহত্তর মহাসভ্যতায় বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা, এসেছে জানবাজ মামলুকদের দাঁতে দাঁত চাপা সংগ্রামের কথা।

এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, কীভাবে একেবারে ধ্বংসের প্রান্ত থেকে আবার একটা সভ্যতা উঠে দাঁড়ায়।

ইতিহাসের বই হলেও এটি প্রথাগত ইতিহাস আলোচনার পথ ধরে আগায়নি। এই বইটি একাডেমিশিয়ানদের জন্য নয়, তাদের জন্য অজস্র বই রয়েছে। এই বই সাধারণ মানুষের জন্য, যারা একের পর এক সাল, তারিখ আর বাহারি নামের চক্করে পড়ে ইতিহাসকে এড়িয়ে চলতে অভ্যস্ত।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলির গৎবাঁধা বিবরণের চেয়ে এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যথাসম্ভব বিশ্লেষণমূলক বিবরণের।

অটোমান সালতানাত এখানে কেন্দ্রীয় উপাদান হলেও মধ্যযুগীয় ইউরোপকেও এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

মুসলিম সুলতান ও সাম্রাজ্যগুলোর ইতিহাস লেখার সময় প্রাচ্য সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন লেখকদের (ওরিয়েন্টালিস্ট) প্রভাব যথাসম্ভব উপেক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে কোনো ঘটনার বিশ্লেষণ করার সময় জাতীয়তাবাদী অতিরঞ্জন এড়ানোরও চেষ্টা করা হয়েছে, যা কোনো কোনো তুর্কি ঐতিহাসিকের মধ্যে উপস্থিত ছিল।

ইতিহাসের বিভিন্ন চাপা পড়ে যাওয়া কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং তাদের পেছনের ঘটনাগুলোকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইয়ে, যা অনেক ক্ষেত্রে মূলধারার ইতিহাসে উপেক্ষিত থেকে যায়।

এই বই একাডেমিক ইতিহাসের ধারা বিবরণী নয়, নয় কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাসও। এ হলো ইতিহাসের ফেলে আসা পথে কিছুক্ষণের একটা সময় পরিভ্রমণ।

অনেক কথা হলো।

এবার আমরা দেখব মঙ্গোলিয়ায় কী ঘটছে। আমরা পা রাখতে যাচ্ছি অটোমানদের দুনিয়ায়।